বর্ধমানে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি : পরিবেশ, পরিস্থিতি না অন্য কিছু?

সুজিৎ চট্টোপাধ্যায়

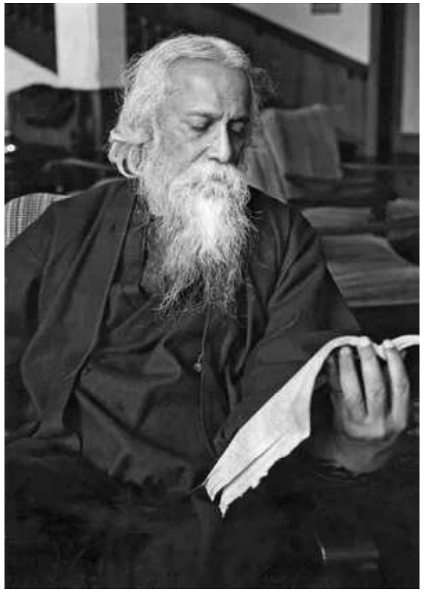

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সারস্বত চর্চার প্রতিষ্ঠান হিসাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস গবেষণায়, জ্ঞানচর্চায়, বাংলার ঐতিহ্য সন্ধানে এক পুরোধা সংস্থা। বঙ্গ সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মেধাচর্চার জগতে এমন কোন ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। ৮ শ্রাবণ, ১৩০০ বঙ্গাব্দে যা ছিল 'বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচার' সেটি ১৭ বৈশাখ, ১৩০১ বঙ্গাব্দে নাম বদল করে হলো 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'। বাংলার তদানীন্তন সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রেমী জমিদারদের অকুণ্ঠ বদান্যতায় পরিষদ স্বাবলম্বী হয়েছে। এঁদের মধ্যে ছিলেন শোভাবাজার রাজপরিবারের বিনয়কৃষ্ণ দেব, কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, লালগোলার জমিদার যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, নাড়াজোলের নরেন্দ্রনাথ দাঁ, ময়মনসিংহের সূর্যকান্ত আচার্য এবং বর্ধমানের মহারাজ বিজয়চাঁদ মহতাব প্রমুখ। পরিষৎ প্রথম থেকেই অভিভাবক হিসেবে পায় রবীন্দ্রনাথকে। পরিষৎ-এর একাদশ সাংবাৎসরিক কার্যবিবরণীতে উল্লেখিত হল ''রবীন্দ্রবাবুর অভিপ্রায় যে, অতঃপর বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে তাহাই

পরিষদের আলোচ্য হউক; যেন পরিষদের কার্যালয়ে আসিলে বাংলাদেশের সম্বন্ধে যে-কোনো জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বার্ষিক অধিবেশন কলকাতায় না করে, রবীন্দ্রনাথ বাংলার বিভিন্ন স্থানে করার প্রস্তাব দেন—"আমরা এই সময়ে এই উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বাংলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। ...এবং পর্যায়ক্রমে এক একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশ সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার, এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে—এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনুকূল্যে আহ্বান করিবার জন্য তাহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।" সেই প্রস্তাবেই ১৩১৪ সালে 'কাশিমবাজারে হয় প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন (১৩১২, ৯ ভাদ্র)। সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই ধারাবাহিকতায় ১৩২১ সালের চৈত্র মাসে (১৯১৫, এপ্রিল) বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদের উৎসাহে বর্ধমানে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, প্রায় এক বছর ধরে মহারাজের আগ্রহাতিশয্যে ও আর্থিক আনুকূল্যে এক বিপুল কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। ১৯১৫ সালের এপ্রিলে তিন দিনের এই অধিবেশন শুরু হয় রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে। সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। অধিবেশনের চারটি শাখায় আলোচনা হয়—সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্য শাখায় ও যদুনাথ সরকার ইতিহাস শাখার সভাপতি ছিলেন। উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে বাংলার বহু বিদগ্ধ ও পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, যেমন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মেঘনাদ সাহা, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যোগেশচন্দ্র রায়, কালিদাস রায়, স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ। বাংলা ছাড়াও অন্য রাজ্য থেকেও প্রতিনিধি আসেন। প্রস্তুতিপর্বের ঠিক বছর আগে অর্থাৎ ১৩২০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বর্ধমান মহারাজ, কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে চিঠি লিখেন, বর্ধমান সম্মিলন করার জন্য। যশোরের মহারাজাও চেয়েছিলেন যশোরে করার জন্য, কিন্তু সবশেষে বর্ধমানেই সম্মিলন হবার সিদ্ধান্ত হয়। ১৩২১ সালের ১০ শ্রাবণ বর্ধমানের টাউনহলে প্রথম জনসাধারণের সভা হয় এবং ২০ ভাদ্র সভায় সম্মিলনের দিনগুলো স্থির হয় এবং ২৭ অগ্রহায়ণ মূল সভাপতি হিসাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম এবং অন্যান্য শাখার সভাপতির নাম স্থির হয়।

এখন প্রশ্ন এতবড় একটা প্রতিষ্ঠানের সাহিত্য সমাবেশ, যার প্রথম থেকেই যিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেখানে তাঁরই কর্মস্থলের কাছে অনুষ্ঠিতব্য সমাবেশে তিনি কেন অনুপস্থিত? তিনি রবীন্দ্রনাথ। ইতিহাস এখানে সম্পূর্ণ নিরুত্তর। জীবনীকাররা কিছু বলেননি। কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী, সমসাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতি পূর্বাপর বিবেচনা করে কিন্তু অনুমান করা যেতেই পারে। আর এই ধরনের সংবেদনশীল বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো সংবেদনশীল ও ঋষিকল্প মানুষ যে কিছু মন্তব্য করবেন না, তা বলাই বাহুল্য কিংবা জীবনের দস্তর।

প্রথমত দেখা যাক, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বর্ধমানের সম্পর্ক কেমন? তিনি ১৯১৫-র এই সম্মিলনের আগে বর্ধমান কতবার এসেছেন? মনে রাখতে হবে, ১৯১৫ সালে কবির

বয়স ৫৪ বছর। এর আগে মাত্র একবার বর্ধমান শহরে তিনি এসেছেন এবং সেটাও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে এবং দায়িত্ববোধ ও সৌজন্যের কারণে। কবি ১৯০৬ সালের ৩০ অক্টোবর (১৩১৩, ১০ কার্তিক) শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রমের শিক্ষক ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের বাড়িতে আসেন। ভূপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের দায়িত্বে ছিলেন এবং আশ্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপর বিশেষ নির্ভর করতেন। ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে কবির অনেক চিঠিপত্রও আছে। সেই ভূপেন্দ্রনাথ বর্ধমানের নূতনগঞ্জের বাড়িতে একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে কবি তাঁকে বর্ধমানে দেখতে আসেন এবং চিকিৎসার জন্য অর্থসাহায্য করেন। সুতরাং এটা ছিল ব্যক্তিগত কারণে ও সহকর্মীর প্রতি দায়িত্ববোধের বিষয়। সেসময় তিনি বর্ধমান মহারাজা বা অন্য কারো আতিথ্য নেননি। হয়তো কেউ জানতেও পারেননি।

এরপর দ্বিতীয় ও শেষবার রবীন্দ্রনাথ বর্ধমানে আসেন ১৯৩৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। অর্থাৎ জীবনের উপান্তে ৭৫ বছর বয়সে। শরীরের দিক থেকে যথেষ্ট অশক্ত অবস্থায় বর্ধমানে আসেন কয়েক ঘণ্টার জন্য। কলকাতায় শিক্ষা সপ্তাহে নবশিক্ষা সংঘর উদ্বোধনী সভায় বক্তৃতা করে বোলপুর ফেরার পথে বিকেল চারটে নাগাদ, বর্ধমান স্টেশনের কাছে বি বি ঘোষ রোডে (বর্তমানে জেলখানা মোড়ের কাছে এক শপিং মলের উল্টোদিক নবনির্মিত বহুতল বাড়িটি এখন যেখানে হয়েছে) আইনজীবী দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে কবি সংবর্ধিত হন এবং সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। এক্ষেত্রে যোগাযোগের সেতু ছিল দেবপ্রসন্ন বাবুর ভগ্নিপতি সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়ার বিখ্যাত জমিদার বংশের সন্তান। এই জমিদার বাড়িতেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' লেখেন টেকচাঁদ ঠাকুর। বর্ধমানে বিকেলে ওই সংবর্ধনা শেষে কবি শান্তিনিকেতন ফিরে যান। সুতরাং বর্ধমানের সঙ্গে কবির আসা-যাওয়ার সূত্র খুবই ক্ষীণ।

এই প্রসঙ্গে বর্ধমান রাজবাড়ির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কেমন ছিল দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই রাজ-আতিথ্য গ্রহণ করেননি। যদিও বাংলার ও বাংলার বাইরের বহু রাজবাড়ির সঙ্গেই কবির নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ত্রিপুরার রাজবাড়ি, কোচবিহারের মহারাজ, কাশিমপুরের রাজবাড়ি এবং সুরুলের জমিদার বাড়ি—অন্যতম। এমনকি সাহিত্য পরিষদের নিজের গৃহ নির্মাণের জন্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সাত কাঠা জমিদান করলে, রবীন্দ্রনাথ তার অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন। ১৯৩৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি বর্ধমানের সংবর্ধনায় মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং সাক্ষাৎ নিশ্চিত ছিল, শোনা যায়, মহারাজ বিজয়চাঁদ সেদিনের অনুষ্ঠানে কবিকে রাজপ্রাসাদ যাবার আমন্ত্রণ জানালে, কবি বলেছিলেন "আমি বর্ধমানের সবচেয়ে বড়লোকের বাড়িতে তো আসিনি। এসেছি এমন একজনের কাছে, যাঁর সঙ্গে আমার আত্মার যোগাযোগ আছে।"

ইতিহাস আরও বলছে, অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ঠিক একমাস আগে কবির সঙ্গে বর্ধমান মহারাজার সাক্ষাৎ হয়। ১৯১৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার, 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী'র উদ্বোধন হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় ছিলেন। হিতসাধনমণ্ডলীর দ্বিতীয় সভা হয় বর্ধমান সম্মিলনের ঠিক একমাস আগে—১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৩ ফাল্গুন বা ১৯১৫, ৭ই মার্চ। দ্বিতীয় সভায় রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' নাটক রচনায়

ব্যস্ততার জন্য প্রথমে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু পরে যান। বিশেষ উল্লেখ্য, ওই সভায় মণ্ডলীর কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি হন মহারাজা বিজয়চাঁদ এবং রবীন্দ্রনাথ অন্যতম সহ-সভাপতি। সুতরাং এই সভায় মহারাজার সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হওয়া স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন, সেখানে কি মহারাজা যিনি বর্ধমানের সমাবেশের, মূল আয়োজক ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তিনি রবীন্দ্রনাথকে সম্মিলনে আসার মৌখিক আমন্ত্রণ জানাননি, যখন মাত্র একমাস পরে বিরাট রাজসূয় যজ্ঞ? এ এক বিরাট প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, পরবর্তীকালে হিতসাধন মণ্ডলীর স্থায়ী সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র বারবার অনুরোধ করলেও রবীন্দ্রনাথ তা গ্রহণ করেননি।

১৯১৫-র এপ্রিলে সম্মিলন হলো, তার মাত্র দেড় বছর আগে ১৯১৩ সালের ১৩ নভেম্বর কবি নোবেল পুরস্কার পান। তিনি খ্যাতির মধ্যগগনে। ১৯১৩ সালের ২৩ নভেম্বর হাওড়া থেকে বিশেষ ট্রেনে কলকাতার বিদ্বজ্জনেরা গিয়ে কবিকে সংবর্ধনা দিয়ে আসেন। সেই অনুষ্ঠানে বর্ধমানের কোনো প্রতিনিধি বা সাহিত্যপ্রেমীরা বর্ধমান থেকে গিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালে বর্ধমান থেকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কোনো সম্মান প্রদর্শনও করা হয়নি। এটা কি কবির বর্ধমান বিমুখতার কোনো নীরব কারণ?

বর্ধমান সম্মিলনের ঠিক আগের অর্তাৎ ৭ম সাহিত্য সম্মিলনে (১৩২০, ২৭ চৈত্র) কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি ছিলেন তাঁর দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বড়দার সঙ্গেই কবি মঞ্চে আসেন। সভাপতি হিসেবে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণ শুরু করেন কিন্তু কিছুটা পড়ার পর অসুস্থতার জন্য বাকি অংশ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন। সুতরাং আগের সম্মিলনে যে রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, সেখানে বর্ধমানে অনুপস্থিতি খুবই আশ্চর্যজনক। প্রসঙ্গত এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং তিনি ভাষণে এই বৎসরে কবির নোবেল প্রাপ্তির খবর উল্লেখ করেন।

বর্ধমানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শীতল সম্পর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে জাল প্রতাপচাঁদ মামলা ও সেই মামলায় তাঁর ঠাকুরদা দ্বারকানাথের মিথ্যা সাক্ষ্য কিংবা বলা যায়, বন্ধুত্বের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনি। বর্ধমানের ইতিহাসে এ এক নির্মম অধ্যায় ও কলঙ্কজনক ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। বর্ধমানের জনতার 'ছোট রাজা' প্রতাপচাঁদ ছিলেন মহারাজ তেজচাঁদের সন্তান এবং রাজইতিহাসে শেষ ঔরসজাত সন্তান। তারপর থেকে বর্ধমানে মহারাজা হন দত্তক পুত্ররা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতামহর সম্পর্কে তেমন কিছুই বলেননি। প্রথম বলেছিলেন দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর 'চরিত্রপূজা'য় 'মহর্ষির আদ্যকৃত্য উপলক্ষে প্রার্থনা' শিরোনামে। তিনি লেখেন "আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল, আমাদের পিতামহের মৃত্যুর পরে এই গৃহের উপর সহসা ঋণরাশি ভারাক্রান্ত কী দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সকলে জানেন।" ১৩২১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে ভবসিন্ধু দত্ত রচিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত' প্রকাশিত হয়। সেই বইয়ে লেখা হয় রবীন্দ্রনাথ দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোন ঘর ইচ্ছামতো ভাঙচুর করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ সেজন্য রবীন্দ্রনাথকে ভর্ৎসনা করেন। তৎক্ষণাৎ এর প্রতিবাদ জানিয়ে ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৩ মাঘ 'প্রবাসী' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "...আমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোনো কিছুই ভাঙিনি, যা কিছু ক্ষণভঙ্গুর তা তিনি নিজেই

একরকম ভেঙে শেষ করে গেছেন, উত্তরবংশীয়দের জন্য অপেক্ষা করেননি।" নিজের পিতামহ সম্পর্কে এমন কঠোর মন্তব্য কবি করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ বহুবার বিলেত গেছেন কিন্তু উত্তর লন্ডনের কেলফাল গ্রিন সেমেট্রিতে দ্বারকানাথের সমাধিতে একবারও যাননি। অথচ বিলেতে রামমোহনের সমাধিতে গেছেন।

এই দ্বারকানাথ ১৮৩৮ সালে বর্ধমানের 'ছোট মহারাজ' তথা প্রতাপচাঁদ মামলায় আদালত ভর্তি লোকের সামনে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে বন্ধু প্রতাপকে জাল বলে ঘোষণা করেন। দ্বারকানাথের মতো মানুষের সাক্ষ্য সেযুগে যথেষ্ট গুরুত্ব পেত; বিশেষ করে তিনি প্রতাপের সঙ্গে কলকাতায় একসঙ্গে থেকেছেন। দ্বারকানাথ ছিলেন 'কার এন্ড টেগোর কোম্পানি'র একজন বৃহৎ অংশীদার এবং এই কোম্পানি বর্ধমান রাজপরিবারের আইনি পরামর্শদাতা ছিল। ফলে রাজপরিবারের মতকে দ্বারকানাথ প্রাধান্য দেন। প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ কি মনে করতেন দ্বারকানাথ রাজপরিবারের ষড়যন্ত্রের শিকার? অভিযোগ আছে, তিনি এর বিনিময়ে অনেক উৎকোচ গ্রহণ করেছিলেন। এই ঘটনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বর্ধমান রাজবাড়ির প্রতি এক ধরনের বীতশ্রদ্ধতা তৈরি করলে, তা অসম্ভব নয়। দ্বারকানাথের সঙ্গে বর্ধমান রাজপরিবারেও সুসম্পর্কের উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, দ্বারকানাথকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে বর্ধমানের মহারাজা তিলকচাদ অর্থঋণ দিয়েছিলেন, একথা দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে আছে (দ্রষ্টব্য : দেবেন্দ্রনাথের স্কন্দে পতিত ঋণভার)। সুতরাং পিতামহের প্রতি রবীন্দ্রনাথের উদাসীনতার কারণ থাকতেই পারে। অথচ দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বর্ধমানের রাজপরিবারের অত্যন্ত সখ্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর একবিংশ পরিচ্ছেদে মহতাবচাঁদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথের পরামর্শে রাজবাড়িতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে বর্ধমানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

'জাল প্রতাপচাঁদ' কাহিনি রবীন্দ্রনাথকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে, 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে 'সঞ্জীবচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যিক সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'জাল প্রতাপচাঁদ' উপন্যাস প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য—" 'জাল প্রতাপচাঁদ' নামক গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র যে ঘটনাসংস্থান, প্রমাণবিচার এবং লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, বিচিত্র জটিলতা ভেদ করিয়া যে-একটি কৌতূহলজনক আনুপূর্বিক গল্পের ধারা কাটিয়া আনিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার প্রতি কাহারো সন্দেহ থাকে না—কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাও মনে হয় ইহা ক্ষমতার অপব্যয় মাত্র। এই ক্ষমতা যদি তিনি কোনো প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিতেন তবে তাহা আমাদের ক্ষণিক কৌতূহল চরিতার্থ না করিয়া স্থায়ী আনন্দের বিষয় হইত।" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। 'জাল প্রতাপচাঁদ' কাহিনির মধ্যে 'প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যাপার' ছিল না, যা ছিল তা হলো 'কৌতুহলজনক আনুপূর্বিক গল্পের ধারা'। অর্থাৎ বর্ধমান রাজবাড়ি, জাল প্রতাপচাঁদ মামলা, দ্বারকানাথ ঠাকুর—এই ত্র্যহস্পর্শে রবীন্দ্রনাথ যে একটা প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করতেন তা মনে করা যেতেই পারে।

এরপর যে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা যায় সেটি হলো, সাহিত্য সম্মিলন আয়োজন হলেও তৎকালীন বর্ধমানের মানুষদের মধ্যে সাহিত্য চেতনা ছিল না। সাহিত্য সম্মিলনের পক্ষে এই পরিবেশগত প্রতিকূলতা কোথাও কি রবীন্দ্রনাথের মনে রেখাপাত

করেছিল? কোথাও কি তাঁর মনে হয়েছিল, 'সাহিত্যবোধহীন' জায়গায় না যাওয়াই বিধেয়? সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকলে তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেখতেন, তাঁর উপস্থিতিতে পঠিত প্রবন্ধে তার তীব্র ও নগ্ন সমালোচনা করা হচ্ছে। ঘটনাক্রম অনুসরণ করা যাক।

সাহিত্য সম্মিলনের শেষ দিনে স্বয়ং মহারাজ বিজয়চাঁদ বর্ধমানবাসীর পক্ষ থেকে যে বক্তব্য রাখেন তা উপরোক্ত ধারণাকেই পুষ্ট করবে—''এখানে সাহিত্য-চর্চার কাজ কেমন হইল, তাহার বিচার আপনারা করিবেন। বর্দ্ধমানবাসী তাহার অধিকারী নহে, কারণ সাহিত্য সম্মিলন বর্দ্ধমানে এই প্রথম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্মিলনে বর্দ্ধমান হইতে যে বেশী প্রতিনিধি গিয়াছেন, তাহাও নহে। বর্দ্ধমানবাসী জানিত না, সাহিত্য-সম্মিলন কি হয় ইহাতে কি হয়, ইহাতে যোগদান করিলে কি লাভ হয়?"

এবার দেখা যাক্, বর্ধমানের মানুষ প্রবাদপ্রতিম সুকুমার সেন তাঁর আত্মজীবনী 'দিনের পরে দিন যে গেল' গ্রন্থে কি লিখেছেন— ''সাহিত্য সম্মিলন হয়েছিল চৈত্রমাসে (১৩২৯)। বর্ধমান শহরের সাধারণ লোকের সাহিত্যের প্রতি কোন বিশেষ ঝোঁক ছিল না। এই সম্মিলনের ঢেউ বর্ধমানবাসীদের তোলপাড় করে দিলে।"

সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবসর আছে। সুকুমার সেন তখন পনেরো বছরের কিশোর, থার্ড ক্লাসে পড়েন। তিনি মূল সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং মূল সভাপতির ভাষণটুকু শুনেছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা—''মূল সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তাঁর বক্তৃতা খানিকটা শুনে, তাঁর বক্তৃতার pamphlet একটা নিয়ে চলে এসেছিলেন। ব্যাস, এই পর্যন্তই আমার সঙ্গে সাহিত্য সম্মিলনের যোগাযোগ। অনেক সাহিত্যিক গিয়েছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাননি। তখন তিনি দেশেই ছিলেন। তিনি না যাওয়াতে সাহিত্য সম্মিলন অগ্নিহীন যজ্ঞের মতো আমার কাছে আদরণীয় হয়নি।" এরপর সুকুমার রবীন্দ্র-বিদূষণের কথা বলেছেন—''তিনি (রবীন্দ্রনাথ) তো আসেনই নি উপরন্তু সভাপতির দুটি অভিভাষণে—মূল সভাপতির ও সাহিত্যশাখার সভাপতির—তাঁর নাম না পেয়ে (—অবশ্য গন্ধ যে একেবারে ছিল না তা নয়, তবে সে না থাকার মধ্যেই—) আমি বিরক্ত হয়েছিলুম। শুধু তাই নয়। সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইঙ্গিতে চিপ্‌টেন কেটেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন সত্য, কিন্তু যাঁরা সেই প্রাইজ দিয়েছেন তাঁরা বাংলা সাহিত্য বোঝেন কতটুকু? রবীন্দ্রনাথ তো কোন 'মহাকাব্য' লিখতে পারেননি, লিখেছেন কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা। সেগুলি 'চুটকি' বই আর কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের যশঃশরীরে এই চিমটি কাটার জবাবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত উপহাসের তুবড়ি ছুটিয়ে দিয়ে শোধ নিয়েছিলেন 'অ' লিখে। সভাপতি-শাখাপতি কাত হয়ে গেল।" সুকুমার সেন শুধুমাত্র শাস্ত্রী মশাইয়ের বক্তব্য শুনেই চলে এসেছিলেন, অন্য কারো প্রবন্ধ পাঠ শোনেননি। সুতরাং বক্তব্য শাস্ত্রী মশাইয়ের বলে মানতে হয়। যদিও পরবর্তীকালে সম্মেলনের কার্যবিবরণী বিস্তারিত প্রকাশ হলে, সেখানে সভাপতির ভাষণে এসব কথা স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। তখন এগুলো লিখিত ভাষণে বক্তব্যের বাইরেও হতে পারে। তবে আগেই বলা হয়েছে ৭ম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীতে সাহিত্যশাখার সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবির সদ্য নোবেল পাওয়ার বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং বাংলার

লেখকদের 'ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' কাছে কৃতজ্ঞ থাকার কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

যাইহোক, প্রথমদিনে এই ধরনের আলোচনা নিয়েই রবীন্দ্রনাথের কানে যাবে। সম্মিলনে সাহিত্য-শাখায় পঠিত দুটি প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথের নামে বিষোদ্গার করা হয়। শ্রী উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তাঁর পঠিত 'সাহিত্য ও তাহার সম্পদ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেন—''রবীন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়া নূতন বিশেষ কিছুই লেখেন নাই; বরং পুরান লেখাই ইংরেজীতে তর্জ্জমা কারিয়া ইউরোপকে উপহার দিয়াছেন। কিন্তু, অদৃষ্টের ফের! এই অনুবাদের জোরেই তিনি 'নোবেল' পুরস্কার পাইলেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তখন বুঝিলেন, তবে ইনি বড় কবি বটেন! সুতরাং দেশে ফিরিয়া আসিবামাত্র গরম গরম ডি.লিট তাঁহার লভ্য হইল।" সাহিত্য-শাখায় রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'নব-নাগরিক সাহিত্য' প্রবন্ধে 'গোরা' উপন্যাসের তীব্র সমালোচনা করে লেখেন ''প্রত্যেক চরিত্র সেখানে মানুষ নহে, একটা ভাবের প্রচণ্ড অভিব্যক্তি। তাহাদের ভাব ও বক্তৃতার বিশ্লেষণের ধুমে মানুষগুলো ছায়াময় হইয়া গিয়াছে।" রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের লেখার সঙ্গে কবির পরিচয় ছিল। চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' পত্রিকায় রাধাকমলের 'সাহিত্য বাস্তবতা' কিংবা ৭ম সাহিত্য সম্মিলনে 'সাহিত্যের আভিজাত্য'—সর্বত্রই তীব্র রবীন্দ্র-বিরোধিতা করে গেছেন। এইসব সমসাময়িক পরিস্থিতিগত পরিণতিই কি রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতির কারণ?

তবে এই প্রসঙ্গে পারিপার্শ্বিক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ঘটনার সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতির কোনো যোগাযোগই নেই। স্থান-কাল-পাত্রের অবস্থান থেকে একটা যোগ ভাবা যেতে পারে। আবার কাকতালীয় হতে পারে। ঘটনাটির সঙ্গে শান্তিনিকেতন ও বর্দ্ধমান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ঘটনাটি নিছকই একটা ফুটবল ম্যাচকে নিয়ে। শন্তিনিকেতনের ছেলেরা একটা প্রতিযোগিতায় ফুটবল খেলতে বর্ধমান আসে। সময়টা ১৯১৪ সাল; আলোচিত সম্মিলনের একবছর আগে। ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন সুকুমার সেন তাঁর আত্মজীবনীতে। তিনি লিখছেন—''১৯১৪ সালে (আমি তখন থার্ড ক্লাসে পড়ি) কোন একটি ট্রফির ম্যাচ খেলতে আসে শান্তিনিকেতনের ছেলের দল। তাঁদের অভিভাবক হয়ে এসেছিলেন উইলিয়াম পিয়ারসন। তখন তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক। লম্বা চেহারা, পায়জামা পাঞ্জাবি পরা। পায়ে বোধ হয় চপ্পল, ঠিক মনে নাই। এমন বেশে ইউরোপীয় মানুষকে আমার প্রথম দেখা। শান্তিনিকেতনের ছেলেরা বয়সে অনেকেই ছোট—খুব ভালো খেলেছিল। বর্ধমানের টিম তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে গুণ্ডামি চালে খেলতে থাকে। তাতে শান্তিনিকেতনের একটি ছেলে মারাত্মক আঘাত পায়। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সে সেখানে মারা যায়। শান্তিনিকেতন থেকে আর কখনো বর্ধমানে ফুটবল খেলতে আসেনি। হোম টিমের এই গোঁয়ার্তুমির জন্য বাইরের দল ক্রমশ বর্ধমানে খেলতে আসা ছেড়ে দিয়েছিল।" ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও নিন্দনীয়, এই অতীব দুঃখজনক ঘটনাটি কবির কানে যাবে এটা নিশ্চিত। তাঁর আশ্রমের ছাত্র অন্যত্র খেলতে গিয়ে খেলার মাঠে অন্যায়ভাবে আহত হয়ে মারা যায়—এর অভিঘাত প্রবল না হয়ে যায় না। শান্তিনিকেতনের দলও আর কোনদিন খেলতে আসেনি! কবিও কি সেই পথের অনুসারী হলেন? এই পারিপার্শ্বিক ঘটনাও কি রবীন্দ্রনাথকে বর্ধমান শহরের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিল? করলে অসম্ভবও নয়।

শেষে একটি বিষয় সবার মনে আসতেই পারে, রবীন্দ্রনাথ ওই সম্মিলনের সময় কোথায় ছিলেন? তিনি কি শান্তিনিকেতনে ছিলেন? তাঁর অবস্থানটির উপরেই সমগ্র বিষয়টি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দেশের কোনো প্রান্তেই নয়, তিনি শান্তিনিকেতনেই দীর্ঘ সময় ওই নির্দিষ্ট সময়সীমায় ছিলেন। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হয় তিনদিন—২০, ২১, ২২ চৈত্র ১৩২১ (৩, ৪, ৫ এপ্রিল ১৯১৫ শনি, রবি, সোমবার)। কবি কলকাতা থেকে ১৬ চৈত্র (৩০ মার্চ, মঙ্গলবার) শান্তিনিকেতনে ফিরে সুরুলের বাড়িতে যান। একটানা সুরুলের বাড়িতে থাকেন এবং বলাকার শেষ পর্বের কবিতা লেখেন। ১৩২২-এর নববর্ষ ছাত্র-শিক্ষককে নিয়ে পালন করেন। যেদিন সুরুলে রথীন্দ্রনাথের গৃহপ্রবেশ হয়েছিল। এ-তথ্য প্রশান্তকুমার পাল মহাশয় জানিয়েছেন।

আরো একটি প্রশ্ন আসে, সম্মিলনে আসার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করা হয়েছিল। সম্মিলনের কার্যবিবরণীতে সে কথা নাই, তবে আমন্ত্রণ নিশ্চয়ই জানানো হয়েছিল, কারণ সম্মিলনের তৃতীয় দিনের অধিবেশনের শেষপর্বে জানানো হয়, কারা কারা আসতে না পারার জন্য 'সহানুভূতিপত্র' পাঠিয়েছেন। প্রথম নামটিই ছিল 'ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। যদিও সেই ঐতিহাসিক পত্রের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না বা পত্রটি পড়াও হয়নি। এই ঐতিহাসিক পত্রটি কেন যে আয়োজকরা সংগ্রহে রাখলেন না বা কার্যবিবরণীতে স্থান দিলেন না—এও এক রহস্য। থাকলেও হয়তো আরেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত। কিন্তু ইতিহাস এখানেও নীরব।

আর একটি তথ্য জানানো দরকার। রাজবাড়িতে বিজয়চাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়নি। তবে মহারাজা বিজয়চাঁদ রবীন্দ্র অনুরাগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদে তিনি ভেঙে পড়েন। তিনি নিজে লিভার ও কিডনির অসুখে ভুগছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ২৬ বছরের ছোট হলেও রবীন্দ্রনাথ মারা যাবার কুড়িদিন পরে মাত্র ৫৪ বছর বয়সে বিজয়চাঁদ মারা যান। দু-জনেরই মৃত্যুকাল ১৯৪১। এই সমাপতনটি আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি। মৃত্যু তাঁদের এইভাবে অন্য এক 'শান্তিনিকেতনে' মিলিয়ে দিল!

তথ্যসূত্র :

১. প্রশান্তকুমার পাল : রবিজীবনী (খণ্ড ৬,৭)
২. প্রভাত মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য—প্রবেশক
৩. সুকুমার সেন : দিনের পরে দিন যে গেল
৪. গোপীকান্ত কোনার, সম্পাদক : অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন বর্ধমান (১ম ও ২য় খণ্ড)
৫. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মজীবনী (সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত)
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চরিত্রপূজা
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আধুনিক সাহিত্য
৮. কৃষ্ণ কৃপালনী : দ্বারকানাথ ঠাকুর : বিস্মৃত পথিকৃৎ (অনুবাদ, ক্ষিতীশ রায়)
৯. রবীন্দ্রনাথের 'পিতামহ' ও 'পিতৃদেব' : প্রথম আলো (অনলাইন পত্রিকা)

—০—